অবক্ষয়ের চোরাবালি ও একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের আহ্বান

আলো-ছায়ার অবয়ব এবং একটি অন্ধকারের ব্যবচ্ছেদ।

ক্যামেরার লেন্স যখন আলো আর ছায়াকে ভাগ করে, তখন অবয়বের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভেতরের মানুষটা। এই সাদা-কালো ফ্রেমে নিজেকে যখন দাঁড় করাই, তখন চারপাশের সমাজটাকে বড় বেশি চেনা অথচ অচেনা লাগে। চিবুকে হাত রেখে যে দৃষ্টি আজ দূরের কোনো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে, সেই অন্ধকারটা আসলে আমাদের চারপাশের চেনা সমাজেরই এক প্রতিচ্ছবি।

আমরা এমন এক অদ্ভুত এবং অবক্ষয়ের সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই বা হাতের ডিজিটাল স্ক্রিনটা অন করলেই কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের টাইমলাইনে চোখ বোলালেই বুকটা কেঁপে ওঠে। শিশু হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ আর খুনের মতো নৃশংস ঘটনা এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, এই চরম অপরাধগুলো যখন ঘটে এমন সব মানুষের হাত ধরে, যাদের সমাজ একসময় পবিত্রতার প্রতীক কিংবা ‘কোরআনের পাখি’ বলে ডেকেছিল।

শৈশবের নিষ্পাপ মুখে যারা একদিন পবিত্র বাণী আউড়েছে, ক্ষমতার লোভে বা বিকৃত মানসিকতায় অন্ধ হয়ে আজ তারাই যখন রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে ওঠে, তখন থমকে দাঁড়াতে হয়। ধর্মের বাহ্যিক লেবাস পরে, মুখে আধ্যাত্মিকতার বুলি আউড়ে ভেতরের শয়তানকে আড়াল করার এই যে চাতুর্য—তা সমাজকে ভেতর থেকে পচিয়ে দিচ্ছে। যাদের একদিন আলোর পথে হাঁটার কথা ছিল, তাদেরই একটা অংশ আজ অন্ধকারের সবচেয়ে বড় কারিগর। এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা নয়, আমাদের সামগ্রিক নৈতিকতার চরম পরাজয়।

মূর্খ সমাজ অনেক সময় অন্ধবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে অপরাধীকে আড়াল করে, কিন্তু একজন সচেতন মানুষের চোখ কখনো এই ভন্ডামিকে মেনে নিতে পারে না।

এই ছবিতে যে আলো আর অন্ধকার দেখছেন, তা কেবল ফটোগ্রাফির টেকনিক নয়। ওটা আসলে আমাদের চারপাশের জীবনেরই গল্প। আলোটুকু আমাদের ভেতরের হারিয়ে যাওয়া বিবেক, আর অন্ধকারটুকু আমাদের চারপাশের এই

নির্মম বাস্তব।

অন্ধকারের গ্রাস থেকে পরিত্রাণের পথ এবং বৌদ্ধিক বিপ্লবের ডাক

এই যে চারপাশের অন্ধকার, অবক্ষয় আর পচন—এ থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? শুধু ফেসবুকের ওয়ালে ক্ষোভ প্রকাশ করলেই কি সমাজ বদলে যাবে? নিশ্চয়ই না। এই সামাজিক মহামারী থেকে বাঁচতে হলে আমাদের যেমন বিচারহীনতার সংস্কৃতি ভাঙতে হবে, তেমনই প্রয়োজন এক মহা বৌদ্ধিক বিপ্লবের।

প্রথমত, আমাদের দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার কঠোরতম প্রয়োগ প্রয়োজন। অপরাধী যখন দেখে অপরাধ করেও সে পার পেয়ে যাচ্ছে, তখনই তার সাহস বেড়ে যায়। শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের বিচার হতে হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এবং তা দ্রুততম সময়ে কার্যকর করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোরতম শাস্তি যখন প্রকাশ্য হবে, তখন লেবাসধারী বা পরিচয়ধারী যেকোনো শয়তানের বুক কেঁপে উঠবে। কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব যেন এই নরপশুদের বাঁচাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

একই সাথে আমাদের “লেবাস সর্বস্ব” ভক্তি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অপরাধীর কোনো ধর্ম হয় না। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অন্ধবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে এই অপরাধীদের আড়াল করার মানসিকতা সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পারিবারিক মূল্যবোধের সংস্কার প্রয়োজন। শিশুদের শুধু কিতাব মুখস্থ করানোই যথেষ্ট নয়, তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নৈতিকতা, মানবিকতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কঠোর নজরদারি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পবিত্র স্থানগুলো কোনো বিকৃত মস্তিস্কের মানুষের অভয়ারণ্য না হয়ে ওঠে।

সবশেষে, আমাদের এই অন্ধবিশ্বাসে বুঁদ হয়ে থাকা মূর্খ সমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন এক তীব্র মস্তিস্কের লড়াই। ক্ষমতার লোভ বা অন্ধ বিশ্বাসের কাছে নত না হয়ে, যেখানেই অন্যায় দেখব সেখানেই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আলো আর অন্ধকারের এই চিরন্তন লড়াইয়ে আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে।

ফ্রেমের এই মানুষটি তাই শুধু ভাবছে না, সে আসলে চারপাশের এই ভন্ডামি আর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই চিন্তাই হোক আমাদের হাতিয়ার, এই কলমই হোক আমাদের প্রতিবাদ। আসুন, আমরা সমস্বরে আওয়াজ তুলি এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে—আমাদের এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের জয় হবেই!

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও আলোকচিত্রী।